কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৃতীয় অধ্যায়: রিসালাতের ঈমান

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৩. ১. ২. মুহাম্মাদ (ﷺ)

প্রথমে আমাদের জানা দরকার মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ) কে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা সবাই কমবেশী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)_এর জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে অবগত আছি। তা সত্ত্বেও তার জীবনী আলোচনার মধ্যে রয়েছে অনেক কল্যাণ। এখানে আমরা সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় উল্লেখ করব।

৩. ১. ২. ১. দেশ ও বংশ

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগে মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ) আরব দেশের প্রাণ কেন্দ্র পবিত্র মক্কা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহর পিতা আব্দুল মুত্তালিব, তার পিতা হাশিম। হাশিম ছিলেন কুরাইশ বংশের, কুরাইশ একটি আরব গোত্র, যারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর।

কুরাইশ বংশ ছিল আরবের শ্রেষ্ঠ বংশ। এ বংশের মধ্যে হাশিমের পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্মানিত পরিবার। মক্কাবাসীরা তাদেরকে ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্বের আসনে স্থান দেন। এই হাশিম পরিবারের অন্যতম নেতা ছিলেন আব্দুল মুত্তালিব। তিনি তার পুত্র আব্দুল্লাহকে মক্কার কুরাইশ বংশের অপর শাখা বানূ যুহ্রার নেতা ওয়াহ্ব ইবনু আব্দু মানাফ বিন যুহরার কন্যা আমিনার সাথে বিবাহ দেন। বিবাহের কয়েক মাস পরে, মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ)_এর জন্মের কয়েক মাস পূর্বে আব্দুল্লাহ খেজুর আনার জন্য মদীনায় (ইয়াসরিবে) তার মাতুলালয়লে গমন করেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল মাত্র ২৫ বৎসর।

৩. ১. ২. ২. জন্ম

আব্দুল্লাহর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ) জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ‘আমুল ফীল’ (عام الفيل) বা হাতির বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন।[1] হাতীর বছর অর্থাৎ যে বৎসর আবরাহা হাতি নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা শরীফ আক্রমণ করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ ছিল।[2]

সহীহ হাদীস থেকে স্পষ্টরূপে জান যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন।[3] হাদীসে নববী থেকে তাঁর জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না। একারণে পরবর্তী যুগের আলিম ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ে ১২টিরও বেশি মত রয়েছে। ইবনু হিশাম, ইবনু সা’দ, ইবনু কাসীর, কাসতালানী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মতামত উল্লেখ করেছেন:

(১). কারো মতে তাঁর জন্মতারিখ অজ্ঞাত, তা জানা যায়নি এবং জানা সম্ভব নয়। তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এটুকুই শুধু জানা যায়, জন্ম মাস বা তারিখ জানা যায় না। এ বিষয়ে কোনো আলোচনা তারা অবান্তর মনে করেন।

(২). কারো কারো মতে তিনি মুহাররাম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(৩). অন্য মতে তিনি সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(৪). কারো মতে তিনি রবিউল আউআল মাসের ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম ঐতিহাসিক মুহাদ্দিস আবু মা'শার নাজীহ বিন আব্দুর রাহমান আস-সিনদী (১৭০ হি.) এই মতটি গ্রহণ করেছেন।

(৫). অন্য মতে তাঁর জন্মতারিখ রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ। আল্লামা কাসতালানী ও যারকানীর বর্ণনায় এই মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন। এই মতটি দুইজন সাহাবী ইবনু আববাস (রা) ও জুবাইর বিন মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাত বিশেষজ্ঞ এই মতটি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন।

(৬). অন্য মতে তাঁর জন্মতারিখ ১০-ই রবিউল আউয়াল। এ মতটি ইমাম হুসাইনের পৌত্র মুহাম্মাদ ইবনু আলী আল বাকের (১১৪ হি) থেকে বর্ণিত। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আমির ইবনু শারাহিল আশ শাবী (১০৪ হি.) থেকেও মতটি বর্ণিত। ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনু উমর আল-ওয়াকিদী (২০৭ হি) এই মত গ্রহণ করেছেন। ইবনু সা'দ তার বিখ্যাত ''আত-তাবাকাতুল কুবরা''-য় শুধু দুইটি মত উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও ১০ তারিখ।[4]

(৭). কারো মতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) _এর জন্মতারিখ ১২ রবিউল আউয়াল। এই মতটি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (১৫১ হি) গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন: ''রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাতির বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।''[5] এখানে লক্ষণীয় যে, ইবনু ইসহাক সীরাতুন্নবীর সকল তথ্য সাধারণত সনদসহ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই তথ্যটির জন্য কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। কোথা থেকে তিনি এই তথ্যটি গ্রহণ করেছেন তাও জানাননি বা সনদসহ প্রথম শতাব্দীর কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী থেকে মতটি বর্ণনা করেননি। এ জন্য অনেক গবেষক এই মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন[6]। তা সত্ত্বেও পরবর্তী যুগে এই মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইবনু কাসীর উল্লেখ করেছেন যে ২ জন সাহাবী জাবির (রা) ও ইবনু আববাস (রা) থেকে এই মতটি বর্ণিত।

(৮). অন্য মতে তাঁর জন্মতারিখ ১৭-ই রবিউল আউয়াল।

(৯). অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ ২২-শে রবিউল আউয়াল।

(১০). অন্য মতে তিনি রবিউস সানী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(১১). অন্য মতে তিনি রজব মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(১২). অন্য মতে তিনি রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ৩য় হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যুবাইর ইবনু বাক্কার (২৫৬ হি) থেকে এ মতটি বর্ণিত। তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বসম্মতভাবে রমযান মাসে নুবুওয়াত পেয়েছেন। তিনি ৪০ বৎসর পূর্তিতে নুবুয়্যত পেয়েছেন। তাহলে তাঁর জন্ম অবশ্যই রমযানে হবে। এছাড়া কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হজ্বের পবিত্র দিনগুলিতে মাতৃগর্ভে আসেন। সেক্ষেত্রেও তাঁর জন্ম রমযানেই হওয়া উচিত। এ মতের সমর্থনে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) থেকে একটি বর্ণনা আছে বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।[7]

৩. ১. ২. ৩. শৈশব ও কৈশর

জন্মের পরে তাঁর মাতা তাঁর নাম রাখেন ‘‘আহমাদ’’, আর তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব তার নাম রাখেন ‘‘মুহাম্মদ’’। মক্কার আধিবাসীরা তাদের নবজাতক সন্তানদেরকে সাধারণত শহরের বাইরে বেদুইন গোত্রদের মধ্যে কিছুদিন লালান পালন করতেন, যেন তারা শহরের মিশ্র পরিবেশের বাইরে বেদুইনদের মাঝে পরিপূর্ণ মানসিক ও দৈহিক পূর্ণতা ও স্বাবলম্বিতা নিয়ে গড়ে ওঠে এবং তাদের ভাষা বিশুদ্ধ হয়। এ নিয়মে জন্মের কিছুদিন পরে মক্কার বাইরে, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এলাকার বেদূইন গোত্র বনু সা’দের হালীমা বিনতু আবু যু'আইব নামক এক মহিলা শিশু মুহাম্মদ (ﷺ)-এর লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে ৫ বৎসর কাটান।

এরপর তিনি মক্কায় তাঁর মাতার কাছে ফিরে আসেন। প্রায় এক বৎসর পর তাঁর মাতা মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর লালন পালনের ভার গ্রহন করেন। আব্দুল মুত্তালিব তার এই এতিম পৌত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ২ বৎসর পরে, ৮ বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর দাদাকেও হারান। মৃত্যুর সময় আব্দুল মুত্তালিব তার পুত্র আবূ তালিবের উপর দায়িত্ব দেন এতিম বালক মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর লালন পালনের। পরবর্তী প্রায় ১৭ বৎসর তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের পরিবারেই অবস্থান করেন।

এসময়ে তিনি মাঝেমাঝে তার চাচার ও অন্যান্য মক্কাবাসীদের ছাগল- ভেড়া চরাতেন মক্কার প্রান্তরে। কখনো চাচার সাথে ব্যবসায়ের ভ্রমণে অংশ নিয়েছেন। তিনি সাধারণ যুবকদের মত গল্পগুজব পছন্দ করতেন না। তিনি কখন কোনো মূর্তিকে স্পর্শ করেননি । মক্কায় প্রচলিত বিভন্ন কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। ৫৯১ খৃষ্টাব্দের দিকে, যখন তার বয়স প্রায় ২০ বৎসর, মক্কার কিছু সৎ ও সাহসী যুবক একত্রিত হয়ে শপথ গ্রহণ করেন যে, তারা সমাজের অত্যাচার রোধ করবেন। শক্তের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবেন এবং দুর্বলের অধিকার আদায় করে দেবেন। যুবক মুহাম্মদ (ﷺ) এই শপথে অংশ গ্রহণ করেন।

৩. ১. ২. ৪. বিবাহ ও নুবুওয়াত-পূর্ব জীবন

২৫ বৎসর বয়সে তিনি খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদ নামক মক্কার একজন ধনী ব্যবসায়ী মহিলার ব্যবসায়ের সামগ্রী নিয়ে সিরিয়ায় গমন করেন। খাদীজা তার সততা ও চারিত্রিক পবিত্রতায় খুবই মুগ্ধ হন। তিনি তার সাথে বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ করেন। উভয়পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতি ও মধ্যস্থতায় বিবাহ সম্পন্ন হয়। এসময়ে খাদিজার বয়স ছিল প্রায় ৪০ বৎসর, এবং মহানবীর বয়স ছিল ২৫ বৎসর।

বিবাহের পরে খাদিজা তার সকল সম্পদ স্বামীর হাতে সমর্পন করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সম্পদ বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যয় করতেন। তিনি অনাথদের লালন পালন, অসহায় ও দুস্থদের সেবা, মুসাফিরদের আতিথেয়তা, আত্মীয়-স্বজনের দেখাশুনা, বিপদগ্রস্তদের সাহায্য ইত্যাদি কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। এ সময়ে তিনি তাঁর সেবা, সততা, অমায়িক ব্যবহার ও চারিত্রিক পবিত্রতার জন্য সমাজে এতই প্রসিদ্ধ হন যে, সমাজের লোকেরা তাঁকে আল আমীন (বিশ্বস্ত) ও আস সাদিক (সত্যবাদী) ইত্যাদী বিশেষণে আখ্যায়িত করত। বিভিন্ন সামাজিক বিরোধিতায় তারা তাঁর সিদ্ধান্ত ও মধ্যস্থতা মেনে নিত।

এ বিষয়ে কাবাঘর নির্মাণকালে হাজার আসওয়াদ বা কাল পাথর পুনস্থাপন বিষয়ক ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। কাবাঘরের সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের পরে পবিত্র হাজ্র আসওয়াদকে কাবাগৃহের দেওয়ালে নির্দিষ্ট স্থানে পুনস্থাপন করার বিষয়ে মক্কার প্রতিটি গোত্র নিজেদের অগ্রাধিকার দাবি করে। প্রত্যেকে তার দাবিতে অনড় থাকে এবং অধিকার রক্ষার্থে যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা করে। মক্কাবাসীরা এক ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। একপর্যায়ে নেতৃবৃন্দ একমত হন যে, প্রথম যে ব্যক্তি গিরিপথের মধ্য থেকে তাদের সামনে আগমন করবেন সকলেই তার

সিদ্ধান্ত মেনে নিবেন। এ সময়ে মুহাম্মাদ (ﷺ) তথায় উপস্থিত হন। তারা সকলেই আনন্দিত হয়ে বলে উঠেন, আল-আমিন এসেছেন! তখন তিনি নিজের চাদরটি বিছিয়ে নিজ হাতে পাথরটি তুলে চাদরের উপর রাখেন। এরপর বিবাদমান সকল গোত্রকে আহবান করেন চাদরটি চারিদিক থেকে ধরে পাথরটি কাবাগৃহের নিকটে নিয়ে যাওয়ার। এরপর তিনি নিজ হাতে পাথরটি কাবার প্রাচীরে পুনস্থাপন করেন। এভাবে মক্কাবাসী ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পায়। এ ঘটনায় নবুয়তের পূর্বেই মক্কাবাসীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক একমত যে, এ ঘটনাটি ঘটেছিল নুবুওয়াতের ৫ বৎসর পূবে, যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর বয়স ছিল ৩৫ বৎসর। কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, এ ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫ বৎসর। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর কিশোর বয়সে এ ঘটনাটি ঘটেছিল।[৪]

৩. ১. ২. ৫. নুবুওয়াত ও মাক্কী জীবন

৪০ বৎসর বয়সে তিনি ক্রমান্বয়ে আল্লাহর ইবাদত ও ধ্যানে আগ্রহী হয়ে পড়েন। তিনি মক্কার বাইরে হেরা পাহাড়ের গুহায় বসে রাতদিন আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতেন। এ বছরেই, অর্থাৎ ৬১০ খৃষ্টাব্দে রমযান মাসে সোমবার (ইংরেজী আগস্ট মাসে), ৪০ বৎসর বয়সে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশতাগনের নেতা জিবরীল আল- আমীন (আঃ) ওহী নিয়ে হেরা পাহাড়ের গুহায় আসেন এবং তাকে কুরআন কারীমের সূরা ইকরার প্রথম কয়েক আয়াত শিক্ষা দান করেন।

এর পরে তিনি আল্লাহর নির্দেশে গোপনে মানুষদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য এবং আল্লাহ ছাড়া সকল উপাস্যকে পরিত্যাগ করার জন্য আহবান জানাতে থাকেন। এভাবে তিন বৎসর তিনি গোপনে ইসলাম প্রচার করেন। এ সময়ে মক্কার কিছু সৎ ও নীতিবান যুবক ইসলাম গ্রহণ করেন।

এর পর আল্লাহ তাকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন। তার নবুয়ত প্রাপ্তির ৪র্থ বৎসর থেকে তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। পরবর্তী প্রায় দশ বৎসর তিনি মক্কায় ইসলাম প্রচারে রত থাকেন।

এসময়ে মূলত তিনি মুলত তাওহীদুল ইবাদাত বা ইবাদতের তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করেন। পাশাপাশি সততা, নৈতিকতা, মানবতা, মানবসেবা ইত্যাদি মৌলিক বিষয় পালনের এবং শির্ক, হত্যা, হানাহানি অত্যাচার ইত্যাদি অমানবিক কর্ম বর্জনের জন্য আহবান করতেন। ইসলামের অন্যান্য বিধান যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমযানের সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি তখনো প্রবর্তিত হয়নি। এগুলি কিছু মক্কী জীবনের একেবারে শেষে এবং বাকি সকল বিধান মদীনায় হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কঠোরভাবে তাঁর এ আহবান প্রত্যাখ্যান করে। আমরা দেখেছি যে, তারা আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান ও প্রতিপালক হিসাবে বিশ্বাস করতেন এবং আল্লাহর ইবাদত করত। পাশাপাশি তারা আল্লাহর প্রিয় ও আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত বান্দা হিসেবে ফিরিশতা, কোনো কোনো নবী, কোনো কোনো কল্পিত ব্যক্তিত্ব ও অন্যান্য দেবদেবীর ইবাদত করত। তারা এদের ইবাদত করাকে পিতাপিতামহদের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইবরাহীম-ইসামাঈল (আঃ)-এর সঠিক ধর্ম বলে বিশ্বাস করত। এজন্য এদের ইবাদত পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করে। আল্লাহ ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নন এ কথাকে তারা উদ্ভট ও অবন্তর কথা এবং যুগযুগ ধরে প্রচলিত পিতা পিতামহের আচরিত ধর্মের অবমাননা বলে মনে করে। তারা বিভিন্ন ভাবে মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)–কে অপমান ও অত্যাচার করতে থাকেন। তাঁর দাওয়াতের যৌক্তিকতা খন্ডন করার কোনো ক্ষমতা

তাদের ছিল না। তারা বুঝতে পারে যে, তাঁর বক্তব্য শুনলে যে কোনো বিবেকবান মানুষ তার বক্তব্য গ্রহণ করবেই। এজন্য তারা মানুষদেরকে তার থেকে দূরের রাখার জন্য চেষ্টা করে। তাকে ধর্মত্যাগী, ধর্মের অবমাননাকারী, যাদুকর, কবি ইত্যাদি বলে মানুষদের মনে তাঁর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির জন্য তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করে।

তাদের শত অপপ্রচার ও বাধা সত্ত্বেও ক্রমে ইসলামের বাণী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ডাকে সাড়া দানকারী নও মুসলিমদের উপর অকথ্য অত্যচার নির্যাতন শুরু করে। কোনো অত্যাচার নির্যাতন বা অপমান-লাঞ্ছনাই মহানবীকে সত্যের আহবান থেকে সরাতে পারে না। তিনি তার সকল অত্যাচারের মধ্যেও একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষদেরকে আহবান করতে থাকেন এবং মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কাফিরদের সীমাহীন অত্যাচারের কারণে শতাধিক মুসলিম নারী ও পুরুষ আফ্রিকার ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। অবশিষ্ট অধিকাংশ মুসলিম তাওহীদ আকড়ে ধরে মক্কাবাসীদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে থাকেন।

এত অত্যাচারের মাধ্যমেও ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে অক্ষম হয়ে মক্কার সকল গোত্র একত্রিত হয়ে সকল মুসলিম এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশের মানুষদের সামাজিকভাবে বয়কট ও অবরুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নুবুয়তের ৭ম থেকে ১০ম সন পর্যন্ত দীর্ঘ তিন বৎসর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর বংশের মানুষদের এবং মুসলিমদের নিয়ে পাহাড়ের উপত্যাকায় অবরুদ্ধ হয়ে অবর্ণনীয় কষ্টে অবস্থান করেন। এ সময়েও তিনি সাধ্যমত দীনের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন।

নবুয়তের ১০ম বৎসরে অবরোধ থেকে মুক্তির কিছু দিন পরে, তাঁর চাচা আবু তালিব ও তার প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা কিছু দিনের ব্যবধানে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জন্য এ ছিল খুবই বেদনাময় বৎসর। স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি তাঁর ব্যাথ্যা-বেদনার প্রিয়তম সাথীকে হারান। অপর দিকে চাচার মৃত্যুতে তিনি সামাজিকভাবে অসহায় হয়ে পড়েন। কারণ আবু তালিব ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত নেতা। তিনি নিজে ইসলাম গ্রহণ না করলেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং কুরাইশদের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। তার কারণে অনেক সময় কুরাইশ নেতারা মহানবীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতে সাহস পেত না। আবু তালিবের মৃত্যুর পরে কুরাইশদের অত্যাচার শতগুণে বৃদ্ধি পায়। তারা তাকে কোনোভাবেই কথা বলতে দিত না। তেমনিভাবে তার ডাকে সাড়া দিয়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রতিও অত্যাচর শতগুণে বৃদ্ধি পায়।

এমতবস্থায় তিনি মক্কার বাইরে ইসলাম প্রচারের কথা চিন্তা করেন। তিনি এ বছরের শেষ দিকে (শাওয়াল মাসে, ৬১৯ খৃষ্টাব্দে মে/জুন মাসে) মক্কার প্রায় ১০০ কিলোমিটার পূর্বে তায়েফ শহরে গমণ করেন। তিনি তাঁর প্রিয় খাদিম যায়িদ বিন হারিসাকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে তায়েফে গমণ করেণ। পথিমধ্যে যে সকল বেদুইন গোত্রকে তিনি দেখতে পান, তাদেরকে তিনি তাওহীদের আহবান জানান। তারা কেউই তার আহবানে কর্ণপাত করে না। তিনি তায়েফে প্রায় দশদিন যাবৎ তাওহীদের আহবান জানান। তিনি তায়েফের সকল গোত্রপ্রধান ও সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের আহবান জানান। তারা কেউই তার ডাকে সাড়া দেয় না। বরং তারা তায়েফের দুষ্টু ছেলেদেরকে তার পিছনে লেলিয়ে দেয়। ছেলেরা তায়েফের পথে পথে গালাগালি করে তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। উপরন্তু তারা তাঁকে পাথর ছুড়ে মারতে থাকে। তিনি রক্তাক্ত দেহে তায়েফ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ভগ্নহৃদয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। সকল কষ্ট ও ব্যথা মেনে নিয়ে তিনি ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করতে থাকেন, যদিও মক্কায় তাঁর অবস্থান বা ইসলাম প্রচার প্রায় অসম্ভব ছিল।

ইব্রাহিম (আঃ)-এর সময় থেকে মক্কায় কাবাঘরের হজ্জ প্রচলিত হয়। তখন থেকে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষেরা যুলহাজ্জ মাসে মক্কায় এসে হজ্জ আদায় করত। যদিও পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে শিরক, মূর্তিপূজা ও বিভিন্ন সামাজিক অন্যায় অনাচার ছড়িয়ে পড়ে, তবুও হজ্জ ও হাজীদের সম্মান ছিল তাদের বিশ্বাসের অংশ। তারা হজ্জের সময়ে সকল প্রকার মারামারি, দৈহিক অত্যাচারকে নিষিদ্ধ মনে করত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হজ্জের এই সুযোগে গোপনে মক্কায় আগত বিভিন্ন এলাকার হাজীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করতে থাকেন। নবুয়তের ১১শ বৎসরের হজ্জ মাওসুমে (৬২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে) মক্কার প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার উত্তরের ইয়াসরীব (মদীনা) শহরে থেকে আগত ৬ জন যুবক হাজী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)_এর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা হজ্জের পরে দেশে ফিরে গিয়ে সেখানে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।

পরবর্তী বৎসরে, নবুয়তের ১২শ বৎসরের হজ্জ মওসুমে (৬২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে) মদীনার আরো কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের সাথে তার প্রিয় সাহাবী মুস'আব বিন উমাইরকে মদীনায় প্রচারক হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মদীনার অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী হজ্জ মওসুমে (নবুয়তের ১৩শ বৎসরে, ৬২২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে) মদীনা থেকে হাজীদের যে কাফেলা আসে তার মধ্যে ৭০ জনেরও বেশি ছিলেন মুসলিম। তাঁরা গোপনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)_এর সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গিয়ে অবস্থান করার আহবান জানান। তাঁরা তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা ও প্রাণের বিনিময়ে হলেও তাঁকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেন।

৩. ১. ২. ৬. মদীনায় হিজরত ও মাদানী জীবন

এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কার নির্যাতিত মুসলিমদেরকে মদীনায় গমন করার (হিজরত করার) অনুমতি দেন। মক্কার কুরাইশ নেতাগণ মদীনায় ইসলামের সাফল্যে বিচলিত হন। তারা যে কোনো মূল্যে ইসলামের অগ্রগতি রোধ করার জন্য এক আলোচনায় মিলিত হন। আলেচনায় তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)_কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন।

এসময়ে মহান আল্লাহ তার রাসূল (ﷺ)_কে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দেন। কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে তিনি মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েন। কাফিররা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাকে খুজে বের করে হত্যা করার জন্য, কিন্তু তার ব্যর্থ হয়। তিনি তাঁর সঙ্গী আবু বকরের সাথে তিন দিন সাওর পাহাড়ের চূড়ার গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকার পর মদীনায় রওয়ানা দেন। নুবুওয়তের ১৪শ বৎসরের সফর মাসের ২৭ তারিখে (১৩ই সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃষ্টাব্দে) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আবু বকর মক্কা ত্যাগ করেন। প্রায় দশ দিন পথ চলার পরে রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখে (২৩শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খৃষ্টাব্দে) তিনি মদীনায় পৌঁছান।

তিনি মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সিদ্ধান্তে মদীনার প্রশাসনিক নেতৃত্ব বা মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মদীনার সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জনগণ এবং অমুসলিম ও ইহূদীদের সাথে নাগরিক চুক্তির মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের শান্তি, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করেন। তিনি মদীনায় তিনি অত্যন্ত শান্তির সাথে মুসলমানদের ইসলাম শিক্ষা দিয়ে থকেন। এ সময় থেকে মহান আল্লাহ ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান নাযিল করেন।

মক্কার কাফিররা তাঁর সাফল্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারা বিভিন্ন ভাবে মদীনার মুসলমানদের ধ্বংসের চেষ্টা করতে থাকে এবং মুসলিমদের উপর বিভিন্নভাবে আক্রমন করতে থাকে। ফলে আল্লাহ মুসলমানদেরকে জিহাদের বা যুদ্ধ

করার অনুমতি দান করেন। কাফিরদের তুলনায় সংখ্যায়, অস্ত্রে ও ক্ষমতায় নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও মহানবী তার প্রিয় সাহাবীদেরকে নিয়ে কাফিরদের মুকাবিলা করেন। পরবর্তী ৮ বৎসরে উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাফিররা পরাজিত হতে থাকে। সর্বশেষে ৮ম হিজরী সালে (৬৩০ খৃ) রামাদান মাসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিম বাহিনী নিয়ে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন। মক্কার কাফিরদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন। এরপর আরব উপদ্বীপের মানুষেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। তিনি আরদেশের বাইরে পারস্য, রোম, মিসর, আবিসিনিয়া ইত্যাদি দেশের শাসকদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে চিঠি লেখেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)_এর মদীনায় হিজরতের ১০ বৎসরের মধ্যে সমস্ত আরব উপদ্বীপ ইসলামের ছায়াতলে স্থানলাভ করে। আরবের বাইরেও ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এই বৎসরে (৬৩২ খৃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) লক্ষাধিক সঙ্গীকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন, যা বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত।

৩. ১. ২. ৭. সর্বশেষ ওসীয়ত ও ওফাত

হজ্জ থেকে ফেরার পরে ১১শ হিজরীর (৬৩২ খৃ) প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি জ্বর ও মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সফর বা রবিউল আউয়াল মাসের কত তারিখ থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত তারিখে ইন্তিকাল করেন সে বিষয়ে হাদীস শরীফে কোনোরূপ উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই। বস্তুত, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীগণ তারিখের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতেন না। এজন্য তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)_এর জীবনের অত্যন্ত ছোটখাট ঘটনাও গুরুত্বের সাথে বর্ণনা ও সংরক্ষণ করেছেন, কিন্তু এ সকল ঘটনার তারিখ কোনো হাদীসে উল্লেখ করেননি। অগণিত হাদীসে তাঁর অসুস্থতা, অসুস্থতা- কালীন অবস্থা, কর্ম, উপদেশ, তাঁর ইন্তিকাল ইত্যাদির ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনো ভাবে কোনো দিন, তারিখ বা সময় বলা হয় নি। কবে তাঁর অসুস্থতা শুরু হয়, কতদিন অসুস্থ ছিলেন, কত তারিখে ইন্তিকাল করেন সে বিষয়ে কোনো হাদীসেই কিছু উল্লেখ করা হয় নি।

২য় হিজরী শতক থেকে তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিমগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনের ঘটনাবলি ঐতিহাসিকভাবে দিন তারিখ সহকারে সাজাতে চেষ্টা করেন। তখন থেকে মুসলিম আলিমগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন।

তাঁর অসুস্থতার শুরু সম্পর্কে অনেক মত রয়েছে। কেউ বলেছেন সফর মাসের শেষ দিকে তাঁর অসুস্থতার শুরু। কেউ বলেছেন রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে তাঁর অসুস্থতার শুরু। দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক (১৫১ হি/৭৬৮ খৃ) বলেন: ‘‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে অসুস্থতায় ইন্তিকাল করেন, সেই অসুস্থতার শুরু হয়েছিল সফর মাসের শেষে কয়েক রাত থাকতে, অথবা রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে।’’[9]

কি বার থেকে তাঁর অসুস্থতার শুরু হয়েছিল, সে বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন শনিবার, কেউ বলেছেন বুধবার এবং কেউ বলেছেন সোমবার তার অসুস্থতার শুরু হয়।[10]

কয়দিনের অসুস্থতার পরে তিনি ইন্তিকাল করেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, ১০ দিন, কেউ বলেছেন, ১২ দিন, কেউ বলেছেন ১৩ দিন, কেউ বলেছেন, ১৪ দিন অসুস্থ থাকার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেন।[11]

তাঁর ওফাতের তারিখ সম্পর্কেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার ইন্তিকাল করেন।[12] কিন্তু এই সোমবারটি কোন্ মাসের কোন্ তারিখ ছিল তা কোনো হাদীসে বলা হয় নি। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রামাদান মাসের ১১ তারিখে ইন্তিকাল করেন।[13] এই একক বর্ণনাটি ছাড়া মুসলিম উম্মাহর সকল ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস একমত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। কিন্তু কোন্ তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেছেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইন্তিকালের তারিখ সম্পর্কে দ্বিতীয় হিজরীর তাবেয়ী ঐতিহাসিকগণ এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের ৪টি মত রয়েছে: ১লা রবিউল আউয়াল, ২রা রবিউল আউয়াল, ১২ই রবিউল আউয়াল ও ১৩ই রাবিউল আউয়াল।[14]

আমরা ১২ই রবিউল আউয়ালকেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাত দিবস ধরে নিয়ে তাঁর ওফাতের পূর্ববর্তী ঘটনাবলি সহীহ হাদীসের আলোকে উল্লেখ করছি। হাদীস শরীফে সাহাবীগণ তারিখ উল্লেখ না করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা বার ও প্রাসঙ্গিক পূর্বাপর ঘটনাদি উল্লেখ করেছেন। আমরা এ সকল বর্ণনার ভিত্তিতেই ঘটনাবলি উল্লেখ করব।

অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে তিনি মসজিদ-সংলগ্ন আয়েশা (রা)-র ঘরে অবস্থান করতে থাকেন। ওফাতের ৫ দিন আগে (রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ) বৃহস্পতিবার[15] তিনি গোসল করেন এবং কিছুটা সুস্থ বোধ করেন। তখন তিনি মসজিদে গিয়ে মিম্বরে বসেন এবং সাহাবীদেরকে অন্তিম উপদেশ নসীহত দান করেন। এছাড়াও তিনি অসুস্থ অবস্থায় বারংবার বিভিন্ন বিষয়ে ওসীয়ত করেন। এ সকল ওসীয়তে তিনি তাওহীদ, সালাত ও বান্দার হক্ক সম্পর্কে সতর্ক করেন। আয়েশা (রা), আবূ হুরাইরা (রা) জুনদুব (রা), আবূ উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ (রা) প্রমুখ সাহাবী বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তেকালের ৫ দিন পূর্বে এবং সর্বশেষ ওসীয়তের বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلا فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. ... لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا. ... يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا ... وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. ... لا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي... اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মানুষেরা তাদের নবীগণ ও ওলীগণের কবরকে মসজিদ (ইবাদতগাহ) বানিয়ে নিত। তোমরা সাবধান! তোমরা কখনো কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেবে না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি এই কাজ থেকে।" ...

"আল্লাহ লানত-অভিশাপ প্রদান করেন ইহুদী ও খৃস্টানদের উপর, তারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল।" একথা বলে তিনি তাঁর উম্মতকে অনুরূপ কর্ম থেকে সাবধান করছিলেন। .... "তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় সবচেয়ে খারাপ মানুষ তারাই যারা তাদের নবীদের কবর মসজিদ বানিয়ে নেয়।" ... "তোমরা আমার কবরকে ইদ (ইদগাহ বা নিয়মিত সমাবেশের স্থান) বানিও না, আর তোমাদের আবাসস্থলকে কবর বানিয়ে নিওনা। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে, কারণ তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌঁছে যাবে।" "হে আল্লাহ, আমার কবরকে পূজিত দ্রব্য বা পূজ্য-স্থানের মত বানিয়ে দিবেন না যার ইবাদত করা হবে, আল্লাহর ক্রোধ কঠিনতর হোক সে সকল মানুষের উপর যারা তাদের নবীগণের কবরগুলিকে মসজিদ

বানায়।’’[16]

এতদিন পর্যন্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত জামাতে সালাতের ইমামতি করছিলেন। বৃহস্পতিবার (৮ই রবি. আউয়াল) মাগরিবের সালাতেও তিনি ইমামতি করেন। এরপর তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। তিনি মসজিদে যেতে সক্ষম হন না। তখন তিনি আবু বকর (রা)-কে ইমামতি করার নির্দেশ দেন।

তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি এ সময়ে বারবার বলছিলেন:

الصَّلاَةَ (الصَّلاَةَ) وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

‘‘সালাত! সালাতের বিষয়ে সাবধান! (কোনোরূপ অবহেলা করবে না) এবং তোমাদের দাস-দাসীদের (অধীনস্থগণের) বিষয়ে সাবধান!’’[17]

সোমবার দিন (১২ই রবিউল আউয়াল, ৬৩২ খৃস্টাব্দের জুন মাসের ৫/৬ তারিখ) দিবসের প্রথম দিকে- দিপ্রহরের পূর্বে- তিনি তাঁর স্ত্রী আয়েশার (রা) কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন। এ সময়ে তিনি মেসওয়াক করেন এবং মৃদুস্বরে কিছু বলতে থাকেন। আয়েশা তার মুখের কাছে কান নিয়ে শুনতে পান তিনি বলছেন: ‘‘তাদের সাথে, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন, নবী-রাসূলগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ, সৎকর্মশীলগণ। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহমত করুন, সর্বোচ্চ সুমহান সঙ্গীদের সাথে আমাকে মিলিত করে দিন। হে আল্লাহ সুমহান সঙ্গীদের সাথে আমাকে মিলিত করে দিন। হে আল্লাহ সুমহান সঙ্গীদের সাথে আমাকে মিরিত করে দিন।’’ এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৬৩ বৎসর।

তার মৃত্যুর সংবাদে শোকে বিহবল হয়ে পড়েন সাহাবীরা। প্রচন্ড শোকে স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন কেউ কেউ। তাঁর ওফাত হতে পারে- এ কথা মানতে কেউ কেউ অস্বীকার করেন। এ বিষয়ে আয়েশা (রা) বলেন:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ بِالسُّنْحِ فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ)، قَالَتْ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلا ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) فَقَبَّلَهُ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا (ﷺ) فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لا يَمُوتُ وَقَالَ: (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ)، وَقَالَ: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ). قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ

‘‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আবূ বাক্র (রা) (মদীনার প্রান্তরে) সুনহ নামক স্থানে ছিলেন। তখন উমার (রা) দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মৃত্যুবরণ করেননি।, আয়েশা (রা) বলেন, উমার (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমার মনে এ ছাড়া অন্য কিছুই আসে নি। নিশ্চিয় আল্লাহ তাকে উঠাবেন এবং তিনি (যারা তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করছে) সে সকল মানুষের হস্তপদ কর্তন করবেন। তখন আবূ বাক্র (রা) আগমন করেন। তিনি (আয়েশার ঘরের মধ্যে রক্ষিত) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)_এর মুবারক দেহের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে তাঁকে চুমু খান এবং বলেন: আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবানি হোন, আপনি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় পবিত্র ও মহান। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনোই দু বার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ

করাবেন না। এরপর তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে (উমারকে সম্বোধন করে) বলেন, হে কসমকারী, একটু শান্ত হও! যখন আবূ বাক্র (রা) কথা বলতে শুরু করলেন, তখন উমার (রা) বসে পড়লেন। তখন আবূ বাক্র আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণবর্ণনা করলেন এবং বললেন, শুনে রাখ! যারা মুহাম্মাদের (ﷺ) ইবাদত করত (তারা জানুক যে,) মুহাম্মাদ (ﷺ) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করত (তারা জানুক যে,) আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি মৃত্যুবরণ করেন না। এবং তিনি (কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে) বলেন[18]: "তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল", এবং বলেন[19]: "মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করবে না, বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করবেন।" তখন মানুষেরা আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে উঠেন।"[20]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর নির্দেশনা অনুসারে আয়েশা (রা)-এর ঘরের মধ্যে যেখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইন্তেকাল করেন সেখানেই তাঁকে দাফন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরদিন মঙ্গলবার (১৩ই রবিউল আউয়াল) উক্ত ঘরের মধ্যে তাঁকে গোসল করান হয় এবং কাফন পরান হয়। এরপর সাহাবীগণ তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন। একক বৃহৎ জামাতে জানাযা হয় নি। সাহাবীগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে উক্ত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে জানাযার সালাত আদায় করে বেরিয়ে যান। এভাবে মঙ্গলবার সারাদিন কেটে যায়। মঙ্গলবার দিনগত রাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–কে দাফন করা হয়।আয়েশার (রা) এই বাড়িটির আয়তন ছিল কমবেশি ১৬ হাত X ৮ হাত। অর্থাৎ ,তাঁর পুরো বাড়িটি ছিল ৩০০ বর্গফুটেরও কম জায়গা। উচ্চতা ছিল প্রায় ৪/৫ হাত। বাড়িটি দুই অংশে বিভক্ত ছিল। মসজিদ সংলগ্ন ৬/৭ হাত প্রশস্ত অংশটুকু বসার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হতো। পিছনের অংশটুকু (১০ হাত X ৮ হাত) শয়ন ও অবস্থানের ঘর বা বেডরুম। এই ঘরের মধ্যে (১০ হাত লম্বা ও ৮ হাত চওড়া) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –কে দাফন করা হয়। দাফনের পরেও আয়েশা (রা.) সেখানে বসবাস করতেন। আর কোনো বসতবাড়ি তাঁর ছিল-না। পরবর্তী কালে আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা)-কেও এই ঘরের মধ্যেই দাফন করা হয়। এই ঘরের মধ্যে কবরগুলির পাশেই আয়েশা (রা.) প্রায় ৫০ বৎসর জীবনযাপনের পর ৫৮ হিজরীতে মুয়াবিয়ার (রা.) শাসনামলে ইন্তেকাল করেন।[21]

ফুটনোট

[1] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৫০, নং ৩৬১৯। তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান গরীব।

[2] আকরাম যিয়া আর-উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ আস-সহীহা ১/৯৬-৯৮, মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ, ১০৯-১১০ পৃ.।

[3] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮১৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ ৪/১৭২-১৭৩, নং ২৫০৬।

[4] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/৮০-৮১।

[5] ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ ১/১৮৩।

[6] মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ, ১০৯ পৃ.।

[7] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/১০০-১০১, ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/২১৫, আল-কাসতালানী, আহমদ বিন মুহাম্মাদ, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা ১/৭৪-৭৫, আল-যারকানী, শরহুল মাওয়াহিব

আল-লাদুন্নিয়্যা ১/২৪৫-২৪৮, ইবনু রাজাব, লাতায়েফুল মায়ারেফ ১/১৫০।
[8] ড. মাহদী রিযকুল্লাহ, আস-সীরাতুন্নাবাবীয়্যাহ ফী দাওইল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ১৩৮-১৩৯।
[9] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নববিয়্যাহ ৪/২৮৯।
[10] কাসতালানী, আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া ৩/৩৭৩; যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব ১২/৮৩।
[11] কাসতালানী, আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া ৩/৩৭৩; যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব ১২/৮৩।
[12] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৬২, ৪/১৬১৬; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩১৫; আবূ নুআইম ইসপাহানী, আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরাজ আলা সাহীহ মুসলিম ২/৪৩-৪৪।
[13] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১২৯।
[14] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১২৯।
[15] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১৪২।
[16] বিস্তারিত বর্ণনাগুলির জন্য দেখুন: বুখারী, আস-সহীহ ১/১৬৫, ১৬৮, ৪৪৬, ৪৬৮, ৩/১২৭৩, ৪/১৬১৪, ৪/১৬১৫, ৫/২১৯০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৭৫-৩৭৮; মালিক, আল-মুআত্তা ১/১৭২; আহমদ, আল-মুসনাদ ১/১৯৫, ২/২৪৬, ৩৭৬; ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১/৫২৩-৫২৪, ৫৩১, ৩/২০০, ২০৮, ২৫৫।
[17] ইবনু মাযাহ, আস-সুনান ১/৫১৮; আলবানী, সহীহ সুনান ইবনি মাজাহ ১/২৭১।
[18] সূরা (৩৯) যুমার: ৩০ আয়াত।
[19] সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৪৪ আয়াত।
[20] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৭/২৯-৩০। আরো দেখুন, বুখারী, আস-সহীহ ১/৪১৮, ৪/১৬১৮; ফাতহুল বারী ৩/১১৩; ৭/১৪, ৮/১৪৫।
[21] বিস্তারিত দেখুন, খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান, পৃ. ৩৭৪-৩৭৮।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13621

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন